মজার গল্প

চোর-ডাকাত



যোগীন্দ্রনাথ সরকার

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ঃ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

মজার গল্প

চোর-ডাকাত



সূচীপত্র :

আলিবাবা ও চল্লিশজন দস্যু

পারস্য দেশের কোন এক নগরে একজন বণিক বাস করিতেন। তাঁহার দুইটি ছেলের মধ্যে বয়সে যেটি বড়, তাহার নাম ছিল কাশিম, আর ছোটটির নাম ছিল আলিবাবা। বণিকের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। মৃত্যুকালে তিনি সামান্য যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছিলেন, দুই ভাই তাহা সমান ভাবে ভাগ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু সে অতি সামান্যই ; তাহাতে কাহারও স্বচ্ছলে দিন চলিবার সম্ভাবনা ছিল না।

কিছুকাল পরে কাশিম একটি বড় লোকের মেয়েকে বিবাহ করিল লোকটির এই একমাত্র কন্যা ভিন্ন আর কেহই ছিল না। বিবাহের অল্পদিন পরেই শ্বশুরের মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার সমস্ত টাকাকড়ি পাইয়া কাশিম খুব বড়লোক হইয়া উঠিল। অধিকন্তু একখানা দোকানেরও মালিক হইল।

আলিবাবাও বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু অর্থাভাবে তাহার সাংসারিক কষ্ট দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। বেচারার সম্পত্তির মধ্যে ছিল তিনটি গাধা। আলিবাবা সমস্ত দিন বনে-জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করিয়া, গাধাগুলির পিঠে চাপাইয়া, প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বাজারে উপস্থিত হইত। সেই কাঠ বিক্রয় করিয়া সামান্য যাহা পাইত, তাহা দ্বারা অতি কষ্টে তাহার দিন চলিত।

একদিন আলিবাবা কাঠ কাটিয়া গাধার পিঠে বোঝাই দিতেছে, এমন সময় দেখিল, দূর হইতে একদল অশ্বারোহী হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। ঘোড়ার খুরে ধূলা উড়িয়া ঠিক যেন মেঘের মত দেখাইতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়াই আলিবাবার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। ভাবিল, হয় ত কোন দস্যুদল দেশ বিদেশ হইতে লুঠপাট করিয়া জঙ্গলের মধ্যে তাহাদের গুপ্ত আড্ডায় ফিরিতেছে! সে তাড়াতাড়ি গাধাগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া একটা গাছে উঠিয়া পড়িল এবং ঘন ডালপালার ভিতর হইতে তাহাদের চাল-চলন লক্ষ্য করিতে লাগিল।

আলিবাবা যে গাছে চড়িয়াছিল, উহার পাশেই খুব বড় একটা পাহাড় ছিল। অশ্বারোহীগণ সেই পাহাড়ের সম্মুখে আসিয়াই ঘোড়া থামাইল। তাহাদের বিকট চেহারা এবং নানা রকম লুঠের জিনিষ দেখিয়া, আলিবাবা বেশ বুঝিতে পারিল যে, সত্য সত্যই তাহারা দস্যু। সে গণিয়া দেখিল, সেই দলে চল্লিশজন দুস্য আছে।

যে লোকটা ইহাদের দলপতি, তাহার সাজগোজ ও চেহারা অতি ভয়ঙ্কর। তাহাকে দেখিবামাত্র আলিবাবার দৈত্য বলিয়া সন্দেহ হইল। যাহা হউক, দলের সকলে ঘোড়া হইতে নামিলে, দলপতি পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "সিসেম দ্বার খোল।" অমনি প্রকাণ্ড এক পাথরের দরজা খুলিয়া গেল। দস্যুগণ ভিতরে প্রবেশ করিলে, দরজাটি পুনরায় বন্ধ হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে দস্যুগণ একেএকে বাহিরে আসিয়া আবার ঘোড়ায় চাপিয়া বসিল। তখন "সিসেম, দ্বার বন্ধ কর"—এই কথা বলিবামাত্র দরজাটি বন্ধ হইয়া গেল। তারপর দস্যুরা যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।



সিসেম দ্বার খোল

আলিবাবা অতি নিকটেই ছিল, দলপতির কথাগুলি বেশ স্পষ্টই শুনিতে পাইল ; কিন্তু সহসা নীচে নামিতে তাহার সাহস হইল না। দস্যুদল বহুদূরে চলিয়া গেলে, সে ধীরে ধীরে নামিয়া, দরজার কাছে গিয়া খুব আস্তে আস্তে বলিল, "সিসেম দ্বার খোল!" দেখিতে দেখিতে দরজাটি খুলিয়া গেল। আলিবাবা ভিতরে প্রবেশ করিয়া একেবারে মোহিত হইয়া গেল। পাহাড়ের চূড়া হইতে গহ্বরের ভিতর পর্যন্ত একটা ফোকর ছিল। সেই ফোকরের

আলোকে আলিবাবা দেখিল, একদিকে রাশি রাশি মোহর, আর একদিকে মণি, মুক্তা, হীরা, জহরতের ছড়াছড়ি। তাহাদের উজ্জ্বল প্রভায় সমুদয় গহ্বরটি যেন ঝক্-মক্ করিতেছে।

আলিবাবা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। তারপর ছয়টি থলি সংগ্রহ করিয়া সেগুলি কেবল মোহর দিয়া ভরিল। শেষে বাহিরে আসিয়া থলিগুলি তিনটি গাধার পিঠে চাপাইয়া ডালপালা দ্বারা এমন ঢাকিয়া ফেলিল যে, কাহার সাধ্য দেখিতে পায়। বাহিরে আসিবার পর আলিবাবা দরজা বন্ধ করিবার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে ভুলে নাই।

আলিবাবা যেরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাতে মোহর সম্বন্ধে তাহার উদ্বেগের কোনই কারণ ছিল না, কিন্তু তথাপি সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না ; পাছে কেহ কিছু জানিতে পারে, সেই ভয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত জঙ্গলের মধ্যেই লুকাইয়া রহিল। সন্ধ্যার পর বনের পথ দিয়া ধীরে ধীরে গাধা চালাইয়া, একেবারে বাড়ীতে উপস্থিত হইল। মোহরের রাশি দেখিয়া আলিবাবার স্ত্রী তো অবাক। কপালের উপর চোখ টানিয়া অনেকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল! শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "এত মোহর তুমি কোথায় পেলে? দুঃখে কষ্টে পড়ে' ডাকাতি আরম্ভ করেছ, না কি?" আলিবাবা বলিল, "ছি ছি। তুমি আমাকে এতটা হীন মনে করতে পারলে। আমি ডাকাতি করিনি, চোরের উপর বাটপাড়ি করেছি!" ইহার পর জঙ্গলে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সকল কথাই খুলিয়া বলিল। তখন আলিবাবার স্ত্রীর আনন্দ দেখে কে। উল্লাসে অধীর হইয়া সে এক একটি করিয়া মোহর গণিতে আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া আলিবাবা বলিল, "তুমি কি পাগল হ'লে? এত মোহর কি গুণে শেষ করা যায়? একটা গর্ত্ত খুঁড়ে তাড়াতাড়ি পুতে ফেল। রাতারাতি এই কাজ শেষ করা চাই। নচেৎ বিপদের সম্ভাবনা।" গৃহিণী বলিল, "আচ্ছা, মেপে রাখি। আমি ও বাড়ীর দিদির কাছ থেকে একটা কুনকে চেয়ে আনি।"



এই দেখ তাতে একটা মোহর আটকে আছে

কাশিমের স্ত্রী আহারাদি শেষ করিয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় আলিবাবার স্ত্রী আসিয়া বলিল, "দিদি, তোমাদের কুনকেটা একবার চাই। একটু দরকার আছে।"

আলিবাবার অবস্থার কথা কাহারো জানিতে বাকী ছিল না। তাহার স্ত্রী কুনকে চায় কেন? কি মাপিবে? কাশিমের স্ত্রীর মনে ভয়ানক সন্দেহ উপস্থিত হইল। সে গোপনে কুনকের তলায় একটু আঠা লাগাইয়া, উহা আলিবাবার স্ত্রীকে আনিয়া দিল। আলিবাবার স্ত্রী বাড়ীতে গিয়া সেই রাত্রেই মোহরগুলি মাপিয়া ফেলিল। তারপর সেগুলি গর্তের মধ্যে লুকান হইলে, কুনকেটা ফিরাইয়া দিয়া আসিল।

এখন ব্যাপার হইয়াছে কি, মাপিবার সময় একটা মোহর সেই কুনকের তলায় আটকাইয়া গিয়াছিল। আলিবাবার স্ত্রী তাহা লক্ষ্য করে নাই। মোহর দেখিয়া কাশিমের স্ত্রী হিংসায় গর গর করিতে লাগিল। ও বাবা! এত বড়লোক যে, কুনকে করিয়া মোহর মাপে! সে আর সহ্য করিতে পারিল না; ছুটিয়া কাশিমকে বলিল, "তুমি তা ভারি ধনের বড়াই কর। তোমার আছে কি? যদি বড় লোক দেখতে চাও আলিবাবার বাড়ী যাও। এই মাত্র তার স্ত্রী কুনকে চাইতে এসেছিল। কি মাপে, দেখবার জন্যে আমি তার তলায় একটু আঠা লাগিয়ে দিয়েছিলাম।

এই দেখ একটা মোহর আটকে রয়েছে। আজকাল তারা কুনকে করে মোহর মাপে।" স্ত্রীর কথায় উত্তেজিত হইয়া কাশিম সেই রাত্রেই আলিবাবার কাছে উপস্থিত হইল। বলিল, "আলিবাবা, সত্যি ক'রে বল, এত ধন তুমি কোথায় পেলে? তোমার স্ত্রী কুনকে ক'রে মোহর মাপে এ তো বড় সহজ ব্যাপার নয়। আমাকে সব খুলে না বললে, আমি এখুনি পুলিশে খবর দেব।"

আলিবাবা দেখিল, তার স্ত্রীর বোকামিতেই এই বিপদ ঘটিয়াছে! এখন আর প্রকৃত কথা লুকাইবার চেষ্টা বৃথা। সে বলিল, "ভাই, তুমি স্থির হও, আমি সকল রহস্যই প্রকাশ করছি।" এই বলিয়া জঙ্গলের মধ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, এক এক করিয়া সব কথায় কাশিমকে বলিল। দরজাটি খুলিবার এবং বন্ধ করিবার মন্ত্রও তাহাকে শিখাইয়া দিল।

কাশিম আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা, একেবারে সমুদয় গুপ্তধন আনিয়া দস্যুদিগকেও ফাঁকি দেয়, আলিবাবারও মুখের গ্রাস কাড়িয়া খায়। পরদিন ভোর হইতে না হইতে কাশিম দশটি গাধা লইয়া সেই পাহাড়ের দিকে চলিল। তার পর যথাকালে সেখানে উপস্থিত হইয়া দরজার সন্ধান করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "সিসেম, দ্বার খোল।" অমনি দরজা খুলিয়া গেল! কাশিম গহ্বরে ঢুকিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে মাথা ঠিক রাখাই দায়। এত সোনা-দানা মণি-মুক্তা দেখিলে কে বা স্থির থাকিতে পারে। যাহা হউক, দেখিতে দেখিতে সে কুড়িটা থলি শুধু মোহরেই ভরিয়া ফেলিল।

কাশিম গহ্বরে ঢুকিবার পর দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; সে দরজার নিয়মই এই আবার খুলিবার মন্ত্র না বলিলে কিছুতেই তাহা খুলে না। ইহাতেই কিন্তু কাশিমের সর্বনাশ হইল। ধনের আনন্দে সে এতটা মত্ত হইয়াছিল যে, আর কোন কথাই তাহার মনে ছিল না। এমন কি দরজা খুলিবার ও বন্ধ করিবার মন্ত্রও সে ভুলিয়া গিয়াছিল। কাশিম ভয়ে পাগলের ন্যায় হইয়া কত কথাই উচ্চারণ করিতে লাগিল; দরজা ধরিয়া কত ঝাঁকাঝাঁকি টানাটানি করিতে লাগিল, তবু কিছুতেই তাহা খুলিল না! তখন সে বেচারার যে কি ভয়ানক অবস্থা, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কাশিম বালকের ন্যায় কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

ঘটনাক্রমে সেই দিনই ডাকাতের দল আসিয়া উপস্থিত। পাহাড়ের সম্মুখে দশটা গাধা দেখিয়া তাহারা ত অবাক্। দলপতি বিশেষ ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিল। কাশিম অমনি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু চল্লিশজন ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া কি সম্ভব। দেখিতে দেখিতে তাহাদের ছোরার আঘাতে কাশিমের দেহ চারি টুকরা হইয়া গেল। আহা! বেচারার সব সাধই মিটিল।

কাশিমকে বধ করিয়াও কিন্তু দুস্যদের ভয় ঘুচিল না। কি জানি, যদি তাহাদের গুপ্ত মন্ত্রের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়া থাকে! যদি আরও কেহ কেহ তাহাদের আড্ডার সন্ধান পাইয়া থাকে। তবেই তো সর্বনাশ। অনেক কল্পনা জল্পনার পর, তাহারা অপরকে ভয় দেখাইবার জন্য কাশিমের দেহের টুকরাগুলি দুই পাশে ঝুলাইয়া রাখিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাশিম বাড়ী ফিরিল না দেখিয়া, তাহার স্ত্রী আলিবাবার কাছে আসিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল। আলিবাবা বলিল, "তোমার কোন ভয় নেই। আমার ভাই নির্বোধ নয়। সন্ধ্যার পর লোকজনের ভীড় কমলে বাড়ী ফিরবে।" কিন্তু কাশিম রাত্রেও বাড়ী ফিরিল না।

পরদিন কাশিমের স্ত্রীর সহিত দেখা হইবার পূর্বেই, আলিবাবা তিনটি গাধা লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল। সে আশা করিয়াছিল, পথেই কাশিমকে দেখিতে পাইবে, কিন্তু পাহাড় পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াও যখন তাহার

সহিত দেখা হইল না, তখন আলিবাবারও খুব ভাবনা হইতে লাগিল। শেষে পাহাড়ের দরজা খুলিয়া আলিবাবা সকল রহস্যই জানিতে পারিল। কিন্তু ভাইয়ের শোকে নিতান্ত কাতর হইলেও সে আসল কাজ ভুলিল না।

তাড়াতাড়ি দুইটি গাধার পিঠে বহু ধন রত্ন এবং অপর গাধাটির পিঠে কাশিমের চারিখণ্ড মৃতদেহ চাপাইয়া আলিবাবা বাড়ীর দিকে ফিরিল। থলিগুলি এমন কৌশলে ঢাকিয়া ফেলিয়া ছিল যে, কাহার সাধ্য প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারে।

বাড়িতে পৌঁছিলে, আলিবাবাকে দেখিয়া কাশিমের স্ত্রী বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল। আলিবাবা বলিল, "চুপ কর! একেই সর্বনাশ হয়েছে, এখন কেঁদে কেটে গোলযোগ করলে আরো বিপদ ঘটতে পারে!" এই বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে সমুদয় ঘটনা খুলিয়া বলিল।

কাশিমের স্ত্রী প্রথমে অধীর হইয়া পড়িয়াছিল! শেষে কতকটা শান্ত হইলে, আলিবাবা বলিল, "তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তবে এখন থেকে আমার বাড়িতেই থাকতে পার।" কাশিমের স্ত্রী সহজেই ইহাতে রাজি হইল। 'মরজিয়ানা' নামে তাহার এক দাসী ছিল। আলিবাবা তাহাকে কাশিমের কবরের বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

মরজিয়ানাকে এক কথা দুইবার বলিতে হয় না। সে তখনই এক হাকিমের দোকানে গিয়া একটা অতি সাংঘাতিক পীড়ার ঔষধ কিনিয়া আনিল। হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার অসুখ?" মরজিয়ানা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "আমার প্রভু কাশিমের অবস্থা খুবই খারাপ; এ যাত্রা রক্ষা পান, কি না, সন্দেহ!" পরদিন মরজিয়ানা পুনরায় সেইদোকানে গিয়া একেবারে শেষ সময়ের ঔষধ চাহিল। হাকিম ঔষধ দিয়া 'হায়, হায়', করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন আলিবাবা ও তাহার স্ত্রীকে কাশিমের বাড়িতে ছুটাছুটি করিতে দেখিয়া পাড়া প্রতিবেশী সকলেই ভাবিয়াছিল, কাহারও কঠিন পীড়া হইয়াছে। শেষে সন্ধ্যার সময় যখন কাশিমের বাড়িতে কান্নারোল উঠিল, কাশিম মরিয়া গিয়াছে বলিয়া সকলে হা-হুতাশ করিতে লাগিল, তখন আর অন্য কোন সন্দেহ কাহারও মনে স্থান পাইল না।

পরদিন ভোরে মরজিয়ানা 'বাবা মুস্তাফা' নামে এক মুচির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "বাবা মুস্তাফা, তোমাকে এখনি একটা কাজ ক'রে দিতে হবে। এই নেও, আগে একটি মোহর দিচ্ছি। কাজটি শেষ হলে আর একটি মোহর পাবে।" বাবা মুস্তাফা গরীব মানুষ। একটা টাকাও সে কখনও চোখে দেখে নাই। হঠাৎ একটি মোহর পাইয়া তাহার আনন্দ আর ধরে না। সে আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিল, "চল, চল,—কি কাজ করতে হবে,—এখনি চল।" মরজিয়ানা বাবা মুস্তাফাকে লইয়া খানিক দূর অগ্রসর হইয়া বলিল, "এইবার তোমার চোখে রুমাল বেঁধে, আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। এই নেও আর একটি মোহর।" বাবা মুস্তাফা দ্বিরুক্তি করিল না; কেবল তাহার অতুল ঐশ্বর্যের কথা ভাবিতে লাগিল। মরজিয়ানা বাবা মুস্তাফার চোখে রুমাল বাঁধিয়া, তাহাকে একেবারে কাশিমের অন্দরমহলে লইয়া গেল

সেখানে একটি অন্ধকার ঘরে মৃতদেহের টুকরাগুলি ছিল; সেইগুলি দেখাইয়া বলিল, "বাবা মুস্তাফা, কাজটা কঠিন, তাই তোমাকে ডেকেছি। এই চার টুকরা এমন করে জুড়বে যে, কেউ যেন বুঝতে না পারে।" বাবা মুস্তাফা পাকা কারিকর; দেখিতে দেখিতে সেই টুকরাগুলি বেমালুম সেলাই করিয়া ফেলিল। তখন মরজিয়ানা আবার তাহার চোঁখ বাঁধিয়া, রাস্তা পর্যন্ত আনিয়া বলিল এখন তোমার চোখের বাঁধন খুলে দিচ্ছি, এই নেও আর একটি মোহর। কিন্তু সাবধান, এ কথা যেন প্রকাশ ন হয়।" বাবা মুস্তাফা কথাটা গোপন রাখিবে বলিয়া বার বার তিনবার শপথ করিয়া, মরজিয়ানাকে প্রাণ ভরিয়া সেলাম করিল। তারপর হাসিতে দোকানে ফিরিয়া গেল।



মরজিয়ানা ও বাবা মুস্তাফা

ইহার পর কাশিমের দেহে কাপড় ঢাকা দিয়া এবং তাহার উপর আতর, গোলাপ জল প্রভৃতি ছিটাইয়া, মরজিয়ানা ধর্মযাজকের নিকট উপস্থিত হইল। ধর্মযাজক আসিলে, কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনের সাহায্যে

কাশিমকে কবর দেওয়া হইল। পাড়া-প্রতিবেশী কাশিমের স্ত্রীর কাতর চিৎকারে ব্যথিত হইয়া ঘরে ফিরিল।

কাশিমের মৃত্যুর একমাস পরে তাহার স্ত্রী আলিবাবার বাড়ীতে চলিয়া আসিল। আলিবাবার পুত্র এক বণিকের দোকানে কাজ-কর্ম শিখিত। এখন হইতে তাহার উপর কাশিমের দোকানের ভার পড়িল।

এদিকে দস্যুদল গহ্বরের মধ্যে কাশিমের মৃতদেহ না দেখিয়া বড়ই ভয় পাইল। ক্রমে অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহারা দেখিল, শুধু যে মৃতদেহ পাওয়া যাইতেছে না, তাহা নহে, মণি-মুক্তা এবং মোহরের রাশিও অনেক কমিয়াছে। তাহাদের ত চক্ষুস্থির। আহা বেচারাদের এত দিনের পরিশ্রম সমস্তই মাটি হইতে বসিয়াছে। যাহারা এমন করিয়া তাহাদের সর্বনাশ করিতেছে, সেই সেই দুর্বৃত্তদের মুণ্ডপাত না করিলেই নয়! দস্যুদল মহা চিন্তার মধ্যে পড়িয়া গেল। অবশেষে দলপতি বলিল, "এ কাজে আমি এক লক্ষ মোহর পুরস্কার ঘোষণা করছি। যে কেউ আসল চোরের সন্ধান বলে দিতে পারবে, সে-ই লক্ষ মোহর পাবে। কিন্তু মনে রেখো, মুখে বড়াই করে শেষে চোর ধরিয়ে দিতে না পারলে, তার প্রাণদণ্ড হবে।"

দলপতির কথায় আর সকলেই চুপ করিয়া রহিল। কেবল একজন সাহসী দস্যু অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমি এই কাজের ভার নিচ্ছি; আমি চোর ধরিয়ে দেব।" এই বলিয়া লোকটা তখনই চোরের সন্ধানে বাহির হইল। সে ঘুরিতে ঘুরিতে ঠিক ভোরের বেলা বাজারে উপস্থিত হইয়া দেখিল, আর সমস্ত দোকানই বন্ধ, কেবল বাবা মুস্তাফা দোকান খুলিয়া কি যেন সেলাই করিতেছে। দস্যু তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল; "তুমি বুড়ো মানুষ, এই অন্ধকার কিছু দেখতে পাচ্ছ কি?" বাবা মুস্তাফা বলিল, "আমি বুড়ো বটে কিন্তু আমার চোখে এখনো বেশ তেজ আছে। এই সেদিন অন্ধকার ঘরে আমি একটা আস্ত মড়া সেলাই করেছি।"


দস্যু ও বাবা মুস্তাফা

দস্যু : মড়া সেলাই করেছ! ব্যাপারখানা কি?

বাবা মুস্তাফা : না, না, মিছে কথা!—মিছে কথা!

দস্যু : কখনো মিছে কথা নয়। আমি জানি, তুমি মিছে কথা বলবার লোক নও। এই নেও মোহর। সেই বাড়ীটি যদি দেখিয়ে দিতে পার তবে আর একটি মোহর পাবে।

বাবা মুস্তাফা : সে অসম্ভব কথা! আমার চোখে তারা রুমাল বেঁধে নিয়ে গেছিল।

দস্যু : আচ্ছা চল, যেখান থেকে তারা রুমাল বেঁধেছিল, আমিও সেখান থেকে তোমার চোখে একখানা রুমাল বেঁধে দেব। তা হলে সেই বাড়ীটা বের করতে তোমার ভুল হবে না!

মোহরের লোভে বাবা মুস্তাফা দস্যুর কথায় রাজী হইয়া তাহার সহিত চলিল। তারপর কতক দূর গিয়া বলিল, "এইবার রুমাল বেঁধে দাও। এখান থেকেই সেদিন তারা আমার চোখে রুমাল বেঁধেছিল।"

দস্যু বাবা মুস্তাফার চোখে রুমাল বাঁধিয়া দিয়া আবার তাহার সঙ্গে চলিল। কতক দূর গিয়া বাবা মুস্তাফা বলিল, "আর যেতে হবে না। আমার বোধ হয়, সেদিন আমি এই পর্যন্ত এসেছিলাম।"

দস্যু দেখিল, বাবা মুস্তাফা একটা খুব বড় বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিয়াছে। তখন তাহাকে বিদায় দিয়া, সে সেই বাড়ির দরজা খড়ির দ্বারা চিহ্নিত করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

মরজিয়ানা তখন কি কার্যে বাহিরে গিয়াছিল। ফিরিবার সময় দরজায় খড়ির চিহ্ন দেখিয়া তাহার মনে কেমন যেন সন্দেহ হইতে লাগিল। সে একখানা খড়ি লইয়া তখনই রাস্তার দুই পাশের সমস্ত বাড়ির দরজায় সেই রকম চিহ্ন দিয়া রাখিল।


দস্যু বাড়ির দরজা খড়ির দ্বারা চিহ্নিত করিল

এদিকে দস্যু বনে গিয়া তাহার সহচরদিগকে চিহ্নিত বাড়ির কথা বলিল। এ সংবাদে দলপতির উৎসাহের সীমা নাই, কিন্তু সেখানে গিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে রাগে আগুন হইয়া উঠিল। সে দেখিল, সেই রাস্তার প্রত্যেক বাড়ির দরজায় একই প্রকার খড়ির চিহ্ন রহিয়াছে। তখন দলপতির হুকুমে সেই দস্যুর প্রাণদণ্ড হইল।

ইহার কয়েক দিন পরে অপর একজন দস্যু বাবা মুস্তাফার সাহায্যে আলিবাবার বাড়ী ঠিক করিয়া, দরজার এমন স্থানে একটি লাল চিহ্ন দিয়া গেল যে, সহজে তাহা কাহারও চোখে না পড়ে। কিন্তু মরজিয়ানার দৃষ্টি এড়ান কঠিন। মরজিয়ানা সেদিন রাস্তার দুই পাশের সব বাড়ীর দরজাতে সেইরূপ লাল চিহ্ন দিয়া রাখিল। সুতরাং সে দস্যুরও প্রাণদণ্ড হইল।



মরজিয়ানা সব বাড়ির দরজায় সেইরূপ চিহ্ন দিয়া রাখিল

অবশেষে দলপতি বলিল, "তোমাদের দিয়ে কিছুই হবে না। আমি নিজে গিয়ে বাড়িটা ঠিক করে আসছি। তোমরা বাজার থেকে ১৯ টা গাধা ও ৩৮ টা তেলের পিপে কিনে আন।" ইহার পর সে বাবা মুস্তাফার সহিত দেখা করিয়া দুইটি মোহর দিয়া বলিল, আমাকে সেই বাড়িটা একবার দেখিয়া দেও।" মোহর পাইয়া বাবা মুস্তাফার লোভ খুব বাড়িয়া গিয়াছিল; দলপতিকে আলিবার বাড়ি দেখাইয়া দিয়া সে আরো কিছু ধন উপার্জন করিল। বাবা মুস্তাফা চলিয়া আসিলে, দলপতি বাড়িটা বেশ ভাল করিয়া চিনিয়া লইল। তারপর জঙ্গলে গিয়া ৩৭ জন দস্যুকে ৩৭ টা পিপার ভিতর ঢুকিতে বলিয়া, নিজের অপর পিপাটি তেলে পূর্ণ করিল। এইরূপে ৩৮টা পিপা পূর্ণ হইল, সেইগুলিকে ১৯টা গাধার পিঠে চাপাইয়া সে জঙ্গল হইতে বাহির হইল!

সন্ধ্যার ঠিক পূর্বে দলপতি আলিবাবার বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সেই রাত্রের জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করিল। বলিল, "আমি বিদেশী বণিক; তেল বেচতে এসেছি। এখানে কারো সঙ্গে আমার জানাশুনা নেই; যদি আজ রাতটুকুর জন্যে আপনি আশ্রয় দেন, তা হলে আমার বড়ই উপকার হয়।



দস্যুর প্রাণদন্ড হইল

দস্যুর কথায় বিশ্বাস করিয়া আলিবাবা তখনই মরজিয়ানাকে ডাকিয়া বলিল, "এই লোকটি তেল বেচতে এসেছে। আজ রাত্তিরে আমাদের এখানেই থাকবে, তুমি এর খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেও। আর এই গাধাগুলো আস্তাবলে পাঠিয়ে দেও। তেলের পিপেগুলো উঠানেই থাক।

রাত্রে আহারাদির পর, আলিবাবা দস্যুর সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া শয়ন করিতে গেল। দস্যু তাহার নির্দিষ্ট বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। আবদুল্লা নামে একজন ক্রীতদাস আর মরজিয়ানা তখনও রান্নাঘরের কার্যে ব্যস্ত ছিল! আলিবাবা ঘুমাইয়া পড়িলে, দলপতি করিল কি আস্তে আস্তে বাহিরে আসিয়া, এক একটি করিয়া সমস্ত পিপার মুখে খুলিয়া ফেলিল এবং দস্যুদিগকে এইরূপ উপদেশ দিল যে, সে ঢিল ছুড়িয়া সঙ্কেত করিবামাত্র যেন সকলে অস্ত্র শস্ত্র লইয়া বাহিরে আসে। পরামর্শ স্থির হইলে, সে আবার তাহার বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

এদিকে হইয়াছে কি, রান্নাঘরের কাজ শেষ হইবার পূর্বেই প্রদীপের তেল ফুরাইয়া গেল। আবদুল্লা বলিল, "বণিকের পিপে থেকে একটু তেল নিলে হয় না?"মরজিয়ানা বলিল, "ঠিক বলেছ।" এই বলিয়া সে যেই একটা পিপার মুখ খুলিয়াছে, অমনি তাহার ভিতর হইতে একজন ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"সময় হয়েছে কি?" মরজিয়ানা পিপার মধ্যে মানুষের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সে বড় সহজ মেয়ে নয়!



৩৭ দস্যুকে পিপার মধ্যে ঢুকিতে বলিল

দস্যুদের চালাকি বুঝিতে তাহার বাকি থাকিল না ! সে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল, "এখন নয় —একটু পরে।" ইহার পর মরজিয়ানা বাকি পিপাগুলি খুলিয়াও ঐ একই প্রশ্ন শুনিয়া সকলকে ঠিক একই প্রকার উত্তর দিল। শেষে মনে মনে প্রতিশোধের উপায় স্থির করিয়া, যে পিপাতে সত্য সত্যই তেল ছিল, তাহা হইতে কয়েক গামলা ঢালিয়া লইল এবং উহা আগুনে চড়াইয়া দিল। তারপর দুইজনে মিলিয়া সেই ফুটন্ত তেল ঢালিয়া ক্রমে ক্রমে ৩৭ জন দস্যুকেই যমালয়ে পাঠাইল।



ফুটন্ত তেল ক্রমে ক্রমে ঢালিয়া ৩৭ জন দস্যুকে যমালয়ে পাঠাইল

দস্যুদল ত নিহত হইল ; এইবার দলপতি কি করে দেখিবার জন্য মরজিয়ানা জানালার পাশে লুকাইয়া রহিল। একটু পরেই সে দেখিল, ছদ্মবেশী বণিক কতকগুলো ঢেলা লইয়া পিপার গায়ে ছুড়িতেছে ! কিন্তু তাহার এই সঙ্কেতে কেহই সাড়া দিল না। তখন সে একে একে পিপাগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে সকলগুলি পরীক্ষা করা হইলে, ভয়ে তাহার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। কি সর্বনাশ ! ৩৭ জন দস্যুর একটিও জীবিত নাই ! দলপতি আর মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া, দেওয়াল টপকাইয়া পলায়ন করিল।

মরজিয়ানা সে রাত্রে কাহাকেও কিছু বলিল না। পরদিন তাহার মুখে ছদ্মবেশী বণিকের বৃত্তান্ত শুনিয়া আলিবাবার চক্ষুস্থির।

মরজিয়ানা ক্রমে ক্রমে দস্যুদলের সকল কথাই প্রকাশ করিল। জঙ্গল হইতে ধনরত্ন আনিবার পর ইহারা যে নানা উপায়ে আলিবাবাকে প্রাণে মারিবার চেষ্টা করিতেছে এবং কেবল মরজিয়ানার বুদ্ধি কৌশলে দস্যুদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া আলিবাবা শতমুখে মরজিয়ানার প্রশংসা করিতে লাগিল। শেষে উৎসাহের সহিত বলিল, "মরজিয়ানা, আজ থেকে তুমি আমার কেনা দাসী নও ; তোমাকে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিচ্ছি। পরে তোমার এই মহৎ কাজের উপযুক্ত পুরস্কার দেব ! এখন লোকগুলার কবরের বন্দোবস্ত কর।"



দলপতি একে একে পিপাগুলি পরীক্ষা করিতে লাগল

আলিবাবার কথায় আহ্লাদিত হইয়া মরজিয়ানা ও আবদুল্লা প্রকাণ্ড একটা গর্ত খুঁড়িয়া মৃতদেহগুলা পুতিয়া ফেলিল। ৪০ জন দস্যুর মধ্যে বাকি রহিল শুধু দলপতি। এখন তাহার কথা বলিতেছি।

সেই রাত্রে ত দলপতি পলায়ন করিল। তারপর বহুকাল আর তাহার দেখা-সাক্ষাৎ নেই। শেষে ছদ্মবেশে ফিরিয়া আসিয়া সে আলিবাবার পুত্রের দোকানের ঠিক সম্মুখে একখানা দোকান খুলিয়া বসিল। দোকানের বিজ্ঞাপনে সে "খাজা হোসেন" নাম প্রচার করিল। সুতরাং লোকে তাহাকে খাজা হোসেন বলিয়াই ডাকিত।

খাজা হোসেন সকলের সহিত এমন ভদ্র ব্যবহার করিতে লাগিল যে, লোকে আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহার মত মিষ্টভাষী প্রায়ই দেখা যাইত না।

আলিবাবার পুত্রের সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। অনেক সময়েই এই দুই বন্ধুকে একত্র আহার বিহার করিতে দেখা যাইত !

একদিন পিতার অনুমতি লইয়া আলিবাবার পুত্র তাহার এই বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিল। খাজা হোসেন যথাসময়ে উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু আহারে বসিতে কোন মতেই রাজী হইল না। সে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিল,. "আমাকে মাপ করুন, আমি কা'রো বাড়িতে খাই না।" কিন্তু আলিবাবা কিছুতেই ছাড়িল না ; বলিল, "এখানে খেতে কি আপত্তি, বলুন ?" খাজা হোসেন বলিল, আমি নুন দেওয়া তরকারী খাই না ; সেই জন্যই কোথাও আহার করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

আলিবাবা বলিল, "আচ্ছা, আমি সে ব্যবস্থা করছি।" ইহার পর পাকশালে গিয়া মরজিয়ানাকে বলিল, "দেখ, ঐ ভদ্রলোকটি নুন দেওয়া তরকারি খেতে রাজী নন। আজ বিনা নুনে তরকারি রাঁধ।"

মরজিয়ানার মনে কেমন যেন সন্দেহ উপস্থিত হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যদি ভদ্রলোক হয়, তবে লবণাক্ত তরকারি খাইবে না কেন ? বোধ হয়, কোন দুষ্ট লোক ছদ্মবেশে প্রভুর সর্বনাশ করিতে আসিয়াছে। যাহা হউক, একবার ভাল করিয়া খবর লইতে হইতেছে। এই ভাবিয়া মরজিয়ানাা দরজার আড়াল হইতে লুকাইয়া সেই লোকটিকে দেখিয়া আসিল, আর দেখিবামাত্রই তাহাকে দস্যুপতি বলিয়া চিনিতে পারিল। কিন্তু তখন কাহাকেও কিছু বলিল না।

আহারাদির পর আমোদ-আহ্লাদ চলিতে লাগিল। মরজিয়ানা নর্তকীর বেশে সজ্জিত হইয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। তাহার হস্তে একখানা তীক্ষ্ণধার ছোরা। সে নাচিতে নাচিতে সেই ছোরা ঘুরাইয়া নানা ক্রীড়া-কৌতুক দেখাইতে লাগিল। আলিবাবার পুত্র খুসি হইয়া তাহাকে একটি মোহর পুরস্কার দিল। দেখাদেখি খাজা হোসেনও কিছু দিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় মরজিয়ানা ছোরা উঠাইয়া সজোরে তাহার বুকে মারিল। সেই এক আঘাতেই সব শেষ।


আজ বিনা নুনে তরকারি রাঁধ

হায় হায় ! কি সর্বনাশ ! কি সর্বনাশ ! এই ব্যাপারে আলিবাবা ও তাহার পুত্র মরজিয়ানার উপর চটিয়া আগুন হইয়া উঠিল। "হতভাগী, তোর এতদূর স্পর্ধা ? ভদ্রলোকের বুকে ছোরা মারতে ভয় হল না ? আজ তোর আর রক্ষে নেই !"

মরজিয়ানা বলিল, "প্রভু, আমি কোন অন্যায় কাজ করি নি। আপনারা অন্ধ, কিন্তু লোকটিকে দেখিবামাত্র আমি চিনেছি,—এ সেই দস্যুপতি। আমি একে না মারলে, আজ আপনারা পিতা-পুত্রে এর হাতে মারা পড়তেন। যখনি লোকটা নুন দেওয়া তরকারি খেতে আপত্তি করেছে, তখনি বুঝেছি, এ আপনাদের চির শত্রু—সেই দস্যু ছাড়া আর কেউ নয়।"

মরজিয়ানার কথায় আলিবাবার চক্ষু ফুটিল। যেদিন হইতে সে দস্যুদের ধনের সন্ধান পাইয়া, তাহার অংশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই তাহারা তাহাকে বধ করিবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। আলিবাবা আত্মরক্ষার জন্য এ পর্যন্ত কিছুই করিতে পারে নাই। কেবল চতুরা মরজিয়ানার বুদ্ধির প্রভাবেই সে তখনও বাঁচিয়া আছে। ভাবিতে ভাবিতে আলিবাবা আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল। তার পর চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল, "মরজিয়ানা, তুমি যে উপকার করেছ, টাকা দিয়ে তার ঋণ শোধ করা যায় না। আগে আমি তোমাকে স্বাধীন ক'রে দিয়েছি ; আজ তোমার সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিয়ে সুখী হব !" এই বলিয়া আলিবাবা পুত্রের দিকে মুখ ফিরাইল। পুত্রও আহ্লাদের সহিত পিতার এই প্রস্তাবে রাজী হইল।

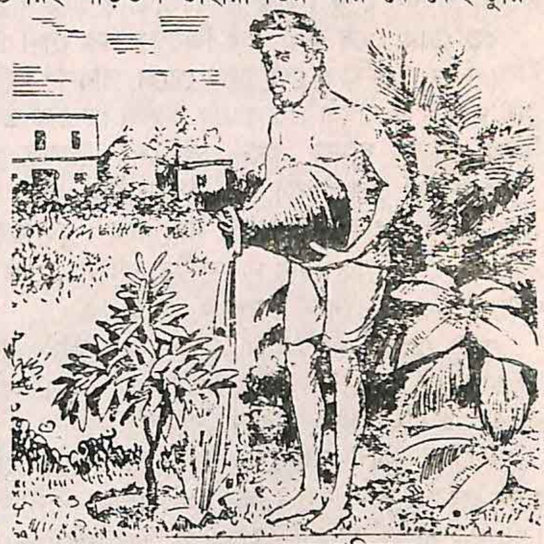
মহা জাঁকজমকে তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল। ইহার পর দস্যুদের বাকি টাকা-কড়ি আনিয়া, আলিবাবা ও তাহার পুত্র মনের সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিল।

আমার কথাটি ফুরুল, ইত্যাদি।

ছোট চোর ও বড় চোর

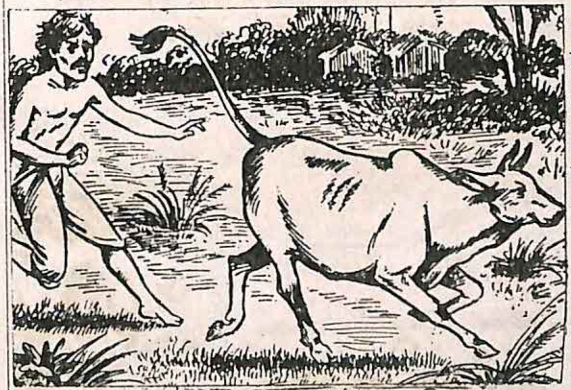
এক গ্রামে দুই পাকা চোর বাস করিত। তাহাদের কাজের মধ্যে ছিল, কেবল চুরি ও বাটপাড়ি। গ্রামে কোথায় কোনও দিন চুরি হইলে, সকলেই বুঝিত, এ সেই হতভাগাদের কাজ। এমন কি, অন্য চোরে চুরি করিলেও লোকের সন্দেহ আগে তাহাদের উপরই পড়িত। তাহারা ভিন্ন আর যে কেহ চুরি করিতে পারে, এ বিশ্বাস ছিল না।

ইহাতে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া একদিন দুইজনে পরামর্শ করিল যে, আর তাহারা চুরি করিবে না ; অন্য কোথাও গিয়া চাকরি-বাকরির চেষ্টা দেখিবে। তাহাদের গ্রাম হইতে তিন ক্রোশ দূরে এক ঘর ধনী লোক বাস করিতেন। তাহারা সেই ধনী গৃহে গিয়া দুইজনে দুইটি কাজের জোগাড় করিল। একজনকে সমস্ত দিন একটা গরু চরাইতে হইবে ; আর একজন প্রত্যহ একটা চাঁপাগাছের গোড়ায় জল দিবে।



বড় চোর গাছে জল ঢালিতেছে

বড় চোর ভারি সেয়ানা। সে ভাবিল, "মাঠে মাঠে কে গরু তাড়াইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়! ও কাজটা ছোট চোরের পক্ষেই মানাইবে ভাল। আমি গাছের গোড়ায় দুই চারি কলসী জল ঢালিয়া সমস্ত দিন বেশ মজা করিয়া বেড়াইব!" এই ভাবিয়া সে গাছে জল দিবার ভার লইল। আর ছোট চোরের ভাগ্যে জুটিল গরু চরান।



সে শিং বাগাইয়া লেজ উঠাইয়া চারি পা তুলিয়া লাফ মারিল

পরদিন ভোরের বেলা ছোট চোর গরু লইয়া বাহির হইল, আর বড় চোর গাছে জল ঢালিতে শুরু করিল। সে ভাবিয়াছিল, দুই চারি কলসী ঢালিলেই গাছের গোড়ায় জল দাঁড়াইবে ; কিন্তু কি সর্বনাশ, যত ঢালে সব জল কোথায় শুকাইয়া যায়! একরত্তি মাটি ভিজিতে না ভিজিতে তাহার আর চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। সমস্ত সকাল, সারা দুপুর, এমন কি, সন্ধ্যা পর্যন্ত শত শত কলসী জল ঢালিল, কিন্তু কিছুতেই সেই পোড়া গাছের গোড়ায় একবিন্দুও দাঁড়াইল না! শেষে একেবারে ক্লান্ত হইয়া বেচারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

ওদিকে ছোট চোরের দুর্দশার অবধি ছিল না। সে যে গরুটা চরাইবার ভার লইয়াছিল, গ্রামের মধ্যে সেইটাই সকলের ওঁচা। তেমন দুরন্ত গরু আশ-পাশে আর একটাও দেখা যাইত না। ছোট চোর গরুটা লইয়া যেই মাঠে গিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে, অমনি সে শিং বাগাইয়া, লেজ উঠাইয়া, চারি পা তুলিয়া লাফ মারিল এবং চক্ষুর পলকে এ মাঠ—সে মাঠ, একজনের ধানের ক্ষেত হইতে অপরের ক্ষেতে, কাহারও তরি-তরকারির বাগানে, কাহারও বা শস্যের খামারে—এইভাবে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। ছোট চোর সমস্ত দিন গরুটার পিছন পিছন ছুটিয়া একেই ভয়ানক ক্লান্ত, তাহার উপর যাহাদের ফসল নষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের গালাগালিতে দুঃখে-কষ্টে একেবারে নাকালের একশেষ হইল। শেষে কোন গতিকে গরুটা ধরিয়া টানিতে টানিতে মনিবের বাড়িতে হাজির করিল। বড় চোর বাহিরেই ছিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভায়া, এত দেরি যে?"

ছোট চোর। কি আর বলি ভাই, বড় সুখেই আজ দিন কেটেছে ; গরুটা যে এত শান্ত, তা আমি আগে মনে করি নি। ভেবেছিলাম, না জানি আজ কত নাকালই হ'তে হবে, কিন্তু আসলে দেখি, কিছুই না। আমিও তাকে ছেড়ে দিলাম, আর সে-ও ধীরে ধীরে চড়ে বেড়াতে লাগল। কাজ নেই কর্ম নেই, শুধু বসে বসে কি করি, কাজেই গামছাখানি বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম ; যেমন শোয়া, অমনি ঘুম। সেই এক ঘুমে একেবারে দিন শেষ। তারপর তাড়াতাড়ি উঠে দড়িগাছি ধরে' এই আসছি ;—আচ্ছা, তোমার খবর কি ?

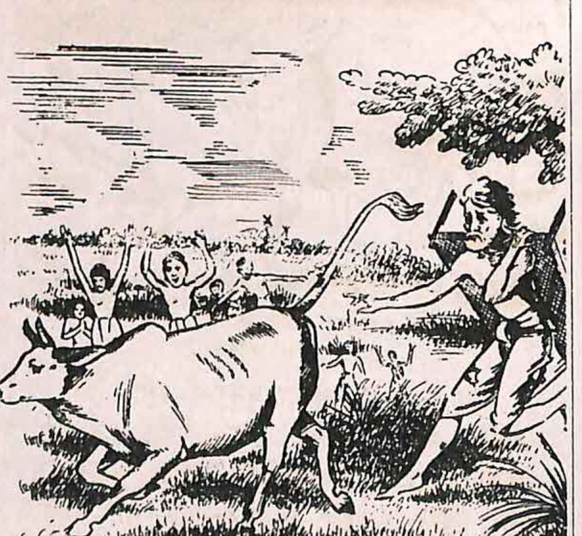
বড় চোর। সে কথা আর জিজ্ঞেস কর কেন ? বড় কপালজোরে এমন সুখের চাকুরি জুটেছে ; এখন টিকলে হয়। তুমি ত সেই চলে গেলে, তারপর আমি গাছের গোড়ায় তিন চার কলসী ঢেলেছি, অমনি জল থৈ থৈ করতে লাগল। আর এক কলসী যে দেব তার জায়গা রইল না। কাজে কাজেই আমিও খানিক ঘুরে ফিরে খানিক ঘুমিয়ে এখন এই শেষ বেলায় চুপচাপ বসে আছি।

কথাবার্তা শেষ হইলে, বড় চোর ভাবিল, গাছে জল দেওয়া অপেক্ষা গরু চরান ঢের সহজ কাজ। ছোট চোর ভাবিল, গরু চরান আর নয়, বাবা। দুই জনেই মনে মনে আপন আপন কাজ বদল করিতে ইচ্ছা করিল। শেষে বড় চোর মুখ ফুটিয়া বলিল, "দেখ ভাই, কাল যদি আমরা পরস্পর কাজ বদল করে নিই, তা'তে তোমার কোন আপত্তি আছে কি ?"

ছোট চোর : একটুও না। বেশ ত, একদিন না হয় তুমি গরুটা চরালে। তবে তোমায় পরামর্শ দি। আজ সমস্ত দিন চষা মাটির উপর শুয়ে আমার গায়ে ব্যথা হয়েছে। তুমি একখানা খাটিয়া সঙ্গে নিও। গাছের ছায়ায় বেশ আরামে ঘুমোতে পারবে।

পরদিন সকাল বেলা চোর গরুটা লইয়া বাহির হইল। আরামে নিদ্রা দিতে পারিবেবলিয়া সে খাটিয়াখানা সঙ্গে লইতে ভুলে নাই। আর ছোট চোর কলসী লইয়া গাছে জল ঢালিতে সুরু করিল। ভাবিয়াছিল দুই চারি কলসী ঢালিবামাত্র গাছের গোড়ায় জল থৈ থৈ করিবে, কিন্তু সর্বনাশ ! দুই শত কলসী জল দিবার পরেও দেখে কি না, একটুও মাটি ভিজে নাই। জল দিতে দিতে বেচারার হাত টনটন এবং বুক কনকন করিতে লাগিল। শেষে সূর্যাস্তের পর ছোট চোর একেবারে নাকাল হইয়া বসিয়া পড়িল।

এদিকে বড় চোরেরও দুর্দশার সীমা রহিল না। গরুটা ত সে-ই, সুতরাং তাহার শয়তানীর পরিচয় আর নতুন করিয়া কি দিব ? ছাড়িবা মাত্র সে শিং বাগাইয়া ছুটিল, বড় চোরের মহা বিপদ উপস্থিত। আরামের জন্য সে খাটিয়া লইয়াছিল, এখন সে খাটিয়াই বা রাখে কোথায়, আর তাহা ঘাড়ে করিয়াই বা ছোটে কিরূপে ? কিন্তু আর উপায় নাই। বেচারাকে সেই খাটিয়া লইয়াই সমস্ত দিন লোকের আনাচে-কানাচে, শস্যের ক্ষেতে, ফল-পাকুড়ের বাগানে, মাঠে ও জঙ্গলে গরুর পিছনে পিছন ছুটাছুটি করিতে হইল। কাঁটাবনের ভিতর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে তাহার দেহ রক্তারক্তি হইল ; নালা ডিঙ্গাইতে পা মচকাইয়া গেল। ইহার উপর আবার লোকের গালাগালিই বা কত ! মাঝে মাঝে গরুটা যদিও বা একটু থামে, কিন্তু ছেলেদের চীৎকার ও হাত-তালিতে তখন আবার ক্ষেপিয়া উঠে এবং ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে থাকে। সন্ধ্যা পর্যন্ত ছুটাছুটি করিবার পর, বড় চোর কোন রকমে গরুটা ধরিয়া ফেলিল। তারপর তাহাকে টানিতে টানিতে যখন মনিবের বাড়িতে পঁহুছিল, তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে।



বেচারাকে সেই খাটিয়া ঘাড়ে করিয়াই সমস্ত দিন গরুর পিছন পিছন ছুটাছুটি করিতে হইল

দুই চোরে আবার একত্র হইল, কিন্তু কাহারও মুখে কথাটি নাই। দুই-জনেই আড়চোখে তাকায় আর মুখ মুচকাইয়া হাসে! রাত্রে আহারাদির পর শয়ন করিয়া তাহারা আপন-আপন দুঃখের কাহিনী আরম্ভ করিল।

ছোট চোর। কি ভায়া, দিনটা গেল কেমন?

বড় চোর। এই তোমার যেমন গেছে, বরং তার চেয়ে আর এককাটি সরেস।

ছোট চোর। যাই বল ভাই, আমার কিন্তু এ চাকুরী আর ভাল লাগে না। আমাদের আগের ব্যবসাই ছিল ভাল।

বড় চোর। তা মিছে নয়। অনেক গরু দেখেছি বাবা, কিন্তু এটার যুড়ি মেলা ভার। উ, সারাটা দিন আজ কি কষ্টই না দেছে!

ছোট চোর। আরে, গরু ত কোন কোনটা দুরন্ত হয়েই থাকে। এর চেয়েও দুষ্টু গরু দেখেছি, কিন্তু বল দেখি, এমন অদ্ভুত চাঁপাগাছ আর কোথায় আছে? আচ্ছা, এত যে জল দিলাম, গেল কোথায়? নীচে পুকুর আছে না কি?

বড় চোর। আমার ইচ্ছে হয়, একবার খুঁড়ে দেখি। কি আছে না আছে, তা হলেই জানতে পারব।

ছোট চোর। তা বেশ ত, সকলে ঘুমিয়ে পড়লে, আজই চল, সন্দেহটা দূর করি।

গভীর রাত্রিতে—যখন জনপ্রাণীর সাড়া-শব্দ নাই—দুই চোর কোদাল, খোন্তা প্রভৃতি লইয়া চাঁপাগাছের গোড়া খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। খানিক খুঁড়িবার পর ছোট চোরের খোন্তা একটা ধাতুপাত্রে লাগিয়া 'টং' করিয়া উঠিল। শব্দ শুনিয়া দুই জনেই অবাক। ছোট চোর চক্ষুর পলকে হাত ঢুকাইয়া দেখিল, পাত্রটি মোহরে ভরা! কিন্তু সে কথা গোপন করিয়া বড় চোরকে বলিল, "ও কিছুই না, একখানা পাথরে খোন্তা লেগে ও-রকম শব্দ হয়েছে।" বড় চোর সবই বুঝিল, কিন্তু এমন ভাব দেখাইল, যেন সে কিছুই বুঝে নাই। কিছু পরে দুই জনে হাত পা ধুইয়া ঘুমাইতে গেল।



দুইজনেই চাঁপা গাছের গোড়া খুঁড়িতে আরম্ভ করিল

আন্দাজ এক ঘণ্টা পরে বড় চোর আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল। ছোট চোর তখন গাঢ় ঘুমে অচেতন। বড় চোর পা টিপিয়া টিপিয়া গর্তের কাছে গিয়া, মোহরের ঘড়াটি উঠাইল। কিছু দূরে আরো একটি ঘড়া ছিল; সেটিও মোহরে ভরা। বড় চোর সেই দুইটি ঘড়া লইয়া তাড়াতাড়ি পুকুরের পাড়ে পুতিয়া রাখিল এবং হাত পা ধুইয়া ধীরে ধীরে আবার ছোট চোরের পাশে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

ছোট চোর এতক্ষণ ঘুমাইতেছিল, হঠাৎ মোহরের স্বপ্ন তাহাকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল। বড় চোর শুইবার অল্প পরেই সে উঠিয়া তাড়াতাড়ি চাঁপাগাছের কাছে গেল। সেখানে মোহরের ঘড়া না দেখিয়া তাহার ত চক্ষুস্থির! কিন্তু তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এ সমস্তই বড় চোর মহাশয়ের চালাকি! যাহা হউক, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। সে আস্তে আস্তে বিছানার পাশে আসিয়া বড় চোরের হাত, পা পরীক্ষা করিতে লাগিল। দেখিল, স্থানে স্থানে কাদার চিহ্ন রহিয়াছে। ছোট চোর তখন বেশ বুঝিতে পারিল, যে, বড় চোর মোহরের ঘড়া পুকুরের পাড়ে লুকাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু পুকুরের ত চারিটা পাড়; কোন পাড়ে রাখিল, জানা যায় কিরূপে? ভাবিতে ভাবিতে ছোট চোর পুকুরের চারি পাড় একবার ঘুরিয়া আসিল। তিন দিক হইতে কতকগুলো ব্যাঙ লাফাইয়া পড়িল দেখিয়া, ছোট চোর বুঝিল যে, বড় চোর সেই তিন দিকে যায় নাই। তারপর অপর দিকে গিয়া একটু খোঁজ করিতেই ছোট চোর মোহরের কলসী দেখিতে পাইল। সে জানিত, কেবল একটি কলসীই পাওয়া যাইবে, কিন্তু যখন মোহরে ভরা আরও একটি কলসী

পাইল, তখন তাহার আর আনন্দের সীমা নাই ! ছোট চোর তাড়াতাড়ি গোয়াল হইতে সেই দুরন্ত গরুটা আনিয়া তাহার পিঠে দুই কলসী মোহর চাপাইয়া রাতারাতি বাহির হইয়া পড়িল !

ভোরের বেলা বড় চোর ছোট চোরকে না দেখিয়া ভয়ে ভয়ে পুকুর পাড়ে গেল। হায় ! হায় ! মোহরের কলসীও নাই আর সেই দুরন্ত গরুটাও নাই ! সে বেশ বুঝিতে পারিল যে, ছোট চোর গরুর পিঠে মোহরের কলসী চাপাইয়া দেশে রওনা হইয়াছে। এখন যেরূপে হউক, তাহাকে ধরা চাই !—এই ভাবিয়া বড় চোর তখনই বাহির হইল। বাজারের ভিতর দিয়া যাইবার সময়, তাহার নিকট টাকা-কড়ি যাহা ছিল, তাহা দিয়া এক জোড়া সুন্দর জুতা কিনিল। সে যে কত সুন্দর, তাহা আর কি বলিব ! তাঁহার উপর সোনার ফিতা, রূপার ফুল ! তার পর বন-জঙ্গলের পথ ধরিয়া সে খুব তাড়াতাড়ি ছুটিতে লাগিল। একটু বেলা হইলে, বড় চোর সদর রাস্তার একস্থানে পৌঁছিয়া দেখিল, ছোট চোর, অনেক পিছনে পড়িয়াছে। গরু চালাইয়া সদর রাস্তার আঁকে-বাঁকে ঘুরিতে ফিরিতে ছোট চোরের দেরী হইয়া পড়িয়াছিল। বড় চোর দূর হইতে তাহাকে আসিতে দেখিয়া, রাস্তার ঠিক মাঝখানে এক পাটি জুতা ফেলিয়া আরো কিছু দূর অগ্রসর হইল ; সেখানে দ্বিতীয় পাটি ফেলিয়া পাশের একটা ঝুপী জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া রহিল। এদিকে ছোট চোর চলিতে চলিতে পথের মাঝে এক পাটি জুতা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। এমন সুন্দর জুতা সে আর কখনও দেখে নাই। ভাবিল "ভাগ্যগুণে আমার অবস্থা এখন রাজা-রাজড়ার তুল্য।

এই জুতা ঠিক আমারই যোগ্য। কিন্তু ইহার জোড়া কোথায় ? অপর পাটি না পাইলে এক পাটি জুতা লইয়া কি করিব ? সে অনেক খোঁজ করিয়াও যখন অপর পাটি পাইল না, তখন প্রথম পাটি এক পাশে ফেলিয়া দিয়া, পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিল। খানিক পরে দ্বিতীয় পাটি তাহার চক্ষে পড়িল। তখন ছোট চোরের ভারি অনুতাপ হইতে লাগিল। ভাবিল, "আমি কি নির্বোধ ? যদি প্রথম পাটি হাতে করিয়া লইয়া আসিতাম, তাহা হইলে কি মজাই না হইত ! যাহা হউক, এখনও বোধ করি পাওয়া যাইতে পারে"—এই ভাবিয়া, সে গরুটা রাস্তার এক পাশে বাঁধিয়া রাখিয়া প্রথম পাটির সন্ধানে ফিরিল। বড় চোর কি এমন সুযোগ ছাড়িতে পারে ! ছোট চোর পিছন ফিরিবামাত্র, সে গরুটাকে বনে-জঙ্গলের পথে চালাইয়া লইয়া চলিল। বড় চোর এমন রাস্তায় গেল যে, কাহারো সাধ্য নাই, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করে।



কি ভায়া খবর ভাল ত ?

বড় চোর সরিয়া পড়িবার পর, ছোট চোর ফিরিয়া আসিয়া দেখে, গরুটা সেখানে নাই। সে বেশ বুঝিতে পারিল যে, ইহা বড় চোরেরই কাজ। তখন খুব তাড়াতাড়ি ছুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছোট চোর একেবারে বড় চোরের বাড়িতে উপস্থিত হইল এবং চুপি চুপি সদর দরজার আড়ালে লুকাইয়া রহিল।



মোহরগুলি একত্র জড়ো করিয়া সমান ভাগ করিতে লাগিল।

তারপর বড় চোর যেই বাড়িতেপা দিয়াছে, অমনি সে হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া বলিল, "কি ভায়া, খবর ভাল ত ? এখন এস মোহরগুলো ভাগ করে' ফেলি।" বড় চোর কোন আপত্তি করিল না।

তখন দুইজনে অন্দরমহলে ঢুকিয়া সমুদয় দরজা, জানালা বন্ধ করিয়া দিল এবং দুই কলসী মোহর একত্র জড় করিয়া, দুই হাতে দুইটি করিয়া তুলিয়া সমান দুই ভাগ করিতে লাগিল। ভাগ শেষ হইলে দেখা গেল,

একটি মোহর বেশী রহিয়াছে। এখন সেইটি কাহার হইবে ? অনেক বাক-বিতণ্ডার পর এই স্থির হইল যে, পরদিন সেইটি ভাঙ্গাইয়া টাকা করিয়া উভয়ে সমান ভাগে লইবে। ভাল, তাহা যেন হইল, কিন্তু মোহরটি রাত্রে থাকে কাহার কাছে ? তাহা লইয়াও খানিক তর্কবিতর্ক চলিল ; শেষে সেইটি কেবল এক রাত্রের জন্য বড় চোরের কাছে রাখাই স্থির হইল। ইহার পর ছোট চোর তাহার অংশ লইয় বাড়িতে ফিরিয়া গেল।

রাত্রে বড় চোর বাড়ির মেয়েদের ডাকিয়া বলিল, "দেখ, কাল সকালেই ছোট চোর মোহরের ভাগ নিতে আসবে, কিন্তু আমি কিছুতেই তা দেব না। তোমরা এক কাজ ক'রো—ভোর হতে না হতে আমাকে উঠোনে শুইয়ে, আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একখানা কাপড় ঢাকা দিও এবং ঠিক মাথার কাছে একটা তুলসী গাছ রেখো।


চেয়ে দেখ আমাদের কপাল পুড়েছে গো

তারপর পথে ছোট চোরকে আসতে দেখলে খুব চেঁচিয়ে কেঁদো ! তা হলে সে নিশ্চয়ই ভাববে রাত্তিরে হঠাৎ আমি মরে গেছি ! মরা লোকের কাছে সে কখনো মোহরের ভাগ চাইবে না।"

মেয়েরা বড় চোরের পরামর্শ মত, পরদিন তাহাকে উঠানে শোয়াইয়া, কাপড় ঢাকা দিয়া রাখিল এবং তাহার মাথার কাছে একটা তুলসী গাছ রাখিয়া দিল। তারপর ছোট চোরকে আসিতে দেখিয়া, সকলে মিলিয়া বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল—"ওগো; কি সর্বনাশ হলো গো। একে তুমি কোথায় নিয়ে গেছিলে ! হায় হায় ! আমাদের কপাল পুড়েছে গো।"


টানিতে টানিতে শ্মশানঘাটে লইয়া চলিল।

শয়তানীতে ছোট চোর আরও পাকা। প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না, কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া সে কাঁদ-কাঁদ সুরে বলিল, "আহা এতকাল পরে আমি সঙ্গীহারা হলাম। যা হোক, আর কেঁদে কি হবে ? তোমরা আপন আপন কাজে যাও ; আমি এর সৎকার করে আসি।" এই বলিয়া সে কতকগুলো খড়ের বিচালী সংগ্রহ করিয়া খুব মোটা একগাছা রসি পাকাইল। তারপর বড় চোরের দুই পা এক সঙ্গে বাঁধিয়া টানিতে টানিতে শ্মশানঘাটে লইয়া চলিল। ছোট চোর ভাবিয়াছিল, রাস্তার পাথরে গা ছড়িয়া গেলে বড় চোর নিশ্চয়ই কথা বলিবে, কিন্তু সেটা তাহারই বুঝিবার ভুল। বড় চোরের গা দিয়া দর্ দর্ ধারে রক্ত ঝরিতে লাগিল, তবুও পাছে মোহরের ভাগ দিতে হয়, এই ভয়ে সে একটি কথাও বলিল না—ঠিক মড়ার মত পড়িয়া রহিল !

তাহাকে টানিতে টানিতে ছোট চোর শ্মশানঘাটে পঁহুছিল ; এইবার তাহাকে দাহ করিতে হইবে। কিন্তু কাঠও নাই আর তাড়াতাড়িতে দিয়াশলাই আনিতেও তাহার মনে ছিল না। এখন যদি সে দিয়াশালাই আনিতে যায়, তা হইলে সবই মাটি হইবার সম্ভাবনা। বড় চোর হয় ত সেই সুযোগে পিট্‌টান দিবে। এখন উপায় কি ? ভাবিতে ভাবিতে ছোট চোরের মাথায় এক ফন্দী জাগিল। সে একটা গাছে চড়িয়া খড়ের রশি ডালে বাধাইয়া টানিতে টানিতে বড় চোরকে উঁচুতে তুলিল। সেই অবস্থায় তাহাকে ঝুলাইয়া রাখিয়া নিজে একটা ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া রহিল। এভাবে বেশীক্ষণ থাকা বড়ই কষ্টকর। ছোট চোর ভাবিয়াছিল, এইবার বড় চোরকে নিশ্চয়ই কথা বলিতে হইবে। কিন্তু ভাগ দিবার ভয়ে কিছুতেই সে কথা বলিল না—ঠিক মড়ার মত ঝুলিতে লাগিল।

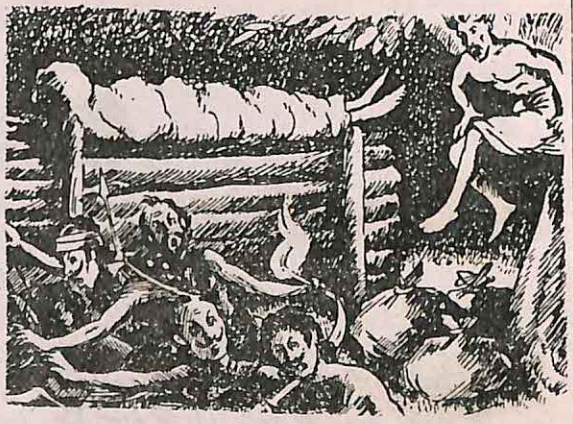
এই সময়ে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল। একদল ডাকাত সেই শ্মশানের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইল, গাছের ডালে একটা মড়া ঝুলিতেছে। কোন কাজে যাইবার পূর্বে মড়া দেখিতে পাওয়া নাকি একটা শুভ লক্ষণ। ডাকাতেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "আজ আমাদের শুভযাত্রা ; সামনে যখন মড়া দেখেছি, তখন লুটপাট্ যে আমাদের মনের মত হবে, তাতে আর সন্দেহ নেই।" দলপতি বলিল, "তা যদি হয়, তবে ফেরবার পথে ওকে পুড়িয়ে যাব।"

ডাকাতেরা সেই রাত্রে এক ধনীর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সর্বস্ব লুঠ করিল। তাহারা এমন কৌশলে গৃহের লোকজনের হাত, পা ও মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল যে, কেহ একটা টু-শব্দও করিতে পারে নাই। সুতরাং পাড়াপড়শী কেহই এই ডাকাতির কথা জানিতে পারিল না। ডাকাতেরা যতটা আশা করিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা-কড়ি, সোনা-দানা পাইল। তাহাদের তখন কি আনন্দ।

হাসিতে হাসিতে শ্মশানঘাটে আসিয়া তাহারা প্রথমেই একটা গর্ত খুঁড়িল ! তারপর বন-বাদাড় হইতে কাঠ আনিয়া চিতা সাজাইল। চিতা প্রস্তুত হইলে, রশি কাটিয়া দেহটি নামাইয়া তাহার পর শোয়াইল। তারপর যেই আগুন দিবার উপক্রম করিতেছে, অমনি সেই মড়া বিকট স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল ! আর ঠিক সেই মুহূর্তে ছোট চোর ভয়ঙ্কর—"হারে—রে—রে" শব্দে শ্মশানভূমি কাঁপাইয়া মাটিতে লাফাইয়া পড়িল।

ডাকাতেরা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে—"বাপ্ রে, মা রে"—ডাক ছাড়িয়া যে যেদিকে পথ পাইল, দৌড় দিল ! টাকাকড়ি সমস্তই পড়িয়া রহিল। তাহাদের আর এমন সাহস হইল না যে, একবার ফিরিয়া চায়। তাহারা ভাবিল, মড়াটাকে নিশ্চয়ই 'দানোয়' পাইয়াছে। আর গেছো-ভূতটা যে তাহাদের ঘাড় ভাঙ্গিবার সন্ধানে ফিরিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ! এই কথা যতই ভাবে, ততই তাহারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে থাকে।

তখন দুই চোরে হাসিতে হাসিতে সেই সমুদয় ধন-দৌলত ভাগাভাগি করিয়া বাড়ি ফিরিল ঃ—



অমনি মড়া বিকটস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল

আমার কথাটি ফুরুল, ইত্যাদি।

Acc No- 14938

প্রকাশক :
রবীন বল
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা ৯

দাম : ৬ টাকা

মুদ্রাকর :
ক্যালকাটা আর্ট ষ্টুডিও প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-১২